Vol. 36 | No. 3 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোক সঙ্গীত ও লোক জীবনের পরিচয়

Volume	36
Issue	3
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিন
Published online	June 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i3.14
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i3.14
Pages	239-246
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোক সঙ্গীত ও লোক জীবনের পরিচয়

মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া লোকসঙ্গীত লোকজীবনের যে ধারা বহমান তা ঐতিহ্যমণ্ডিত। এখানে লোকদের মুখে মুখে অনেক গান প্রচলিত রয়েছে। এই সব গানের রচয়িতা কে তা বলা কঠিন। কিন্তু এইগুলোর আবেদন চিরন্তন। গ্রামের সহজ-সরল মানুষের অকপট হৃদয়ের অভিব্যক্তিই এই গান। এই গানে আছে মাটির মানুষের প্রাণের ছোঁয়া। এই গানের বিষয় হয়ে উঠেছে পল্লীর মানুষের মনের কথা, হৃদয়ের আকুলতা-ব্যাকুলতা, সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না, বিরহ-ব্যথা, প্রেম-ভালবাসা, আচার-বিশ্বাস ইত্যাদি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকসঙ্গীতের আলোচনার মাধ্যমেই উল্লিখিত বিষয়ের যথার্থতা নিরূপণ করা যেতে পরে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়ও বিয়ে উপলক্ষে গান গীত হয়ে থাকে। মেয়েরা একত্রিত হয়ে এই গান গেয়ে থাকে। এই সব মেয়েলী গানে লোকজীবনের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

এক সময়ে গ্রামের যুবকেরা বিয়ের কথা মুখে আনতে পারতো না। তাই লোকসমাজের ভয়ে যুবকেরা বিয়ের কথা না বলে চোখের পানি ফেলতো। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি বিয়ের গানে এই দৃশ্যটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে:

মাছে ভাতে খাইয়া জামানরে ভূইয়া,
জামান ভূইয়ারে পালঙ্গে শোতিল।
পান মুখ দিয়া জামানরে ভূইয়া–
জামান ভূইয়ারে কান্দে ঝর্ ঝর্।।
কিসের দুঃখে কান্দ-জামানরে ভূইয়া,
জামান ভূইয়ারে-ভাইঙ্গা কওনা শুনি।
ভাতের লইগ্যা কান্দিনা মাওগো জননী
ছানের লইগ্যা কান্দিনা মাওগো জননী,
মা জননী গো ঘরে নাই মোর স্তিরী।
হালের বলদ বেইচ্চা–জামানরে ভূইয়া,–
জামান ভূইয়ারে-আইন্যা দিমু স্তিরি।।

জেডী ধনে জিগ্যায়-জামানরে ভূইয়া,
জামান ভূইয়ারে-ভাইঙ্গা কওনা শুনি।
ভাতের লইগ্যা কান্দি না-জেডী ওগো জননী,
ছানের লইগ্যা কান্দিনা--জেডী ওগো জননী,
জেডী জননী গো ঘরে নাই মোর স্তিরি।
গলার হার বেইচ্চা-জামানরে ভূইয়া,-
জামান ভূইয়ারে-আইন্যা দিমু স্তিরি।।
চাচীজানে জিগ্যায়-জামানরে ভূইয়া,
জামান ভূইয়ারে--ভাইঙ্গা কওনা শুণি।
ভাতের লইগ্যা কান্দিনা চাচী ওগো জননী,
ছানের লইগ্যা কান্দিনা চাচী ওগো জননী,
চাচী জননীগো-ঘরে নাই মোর স্তিরি।
গলার মাদলী বেইচ্চা--জামানরে ভূইয়া,
জামান ভূইয়ারে আইন্যা দিমু স্তিরি।।

গ্রামের বিয়েতে বরের বাড়িতে যে গান গাওয়া হয় এর অধিকাংশ গানেই কনে পক্ষের আত্মীয় স্বজনদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে কনে পক্ষের বাড়ীতে যে গান গীত হয়ে থাকে সে গানে বরের আত্মীয় স্বজনদের হেয় করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের এমনি একটি গান--

কইন্যার মার হাইছের মইদ্যেলো লাম্বা লাম্বা বাইগুন,
এইনা বাইগুন চুরি করল্লো দুলার অইনা বাবা।
এইনা চোর ধরাত পড়ল্লো আখাউড়ার থানায়,
কেহই মারে লাতি গোতা কেহই ছিড়ে দাড়ি।
কইন্যার মার হাইছের মইদ্যেলো লাল মরিচের চারা,
এইনা মরিচ চুরি করল্লো দুলার অইনা জেডা।
এই না চোর ধরাত পড়ল্লো আগরতলার রোডে,
কেহই মারে লাতি গোতা কেহই কাড়ে কান।
কইন্যার মার হাইছের মইদ্যেলো ফুল বাগিচার চারা,
এইনা চারা চুরি করল্লো দুলার বইনের জামাই।
এইনা চোর ধরাত পড়ল্লো দিন দুইপুরের বেলা,
কেহই মারে লাতি গোতা কেহই ছিড়ে চুল।

কিছু গানে বধূ কিভাবে স্বামীর মন ভুলিয়েছে তার উত্তর আছে।

গানভরি আঘাত কাডা বাইগন--
কেবা বাঁশী বাজায়রে।
শাম চিকণ কালারে, আর বাজায় বাঁশী
শাম চিকন কালারে।।
মা হইয়া পঞ্চম করে ও পুত্র ধনরে--
ঘরে আইসা খাও দুতভাত।
তোমার দুতভাত তুমি খাও,-

তুমি মা ঘরে যাও,
আমি যাইব কামিনী বাসরে।।
মা হইয়া দিছি গালী ও বঁধূ রাণী,
কি দিয়া ভুলাইলি আমার কালার মন,
হাতে লইছি আয়না কাকুই--
ঠোঁডে দিছি ঠোড্ পালিশ,
আর ঠ্যামাকে ভুলাইছি কালা রাজার মনরে।।

বিয়ের পরে গ্রানের মেয়েরা বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যায়। এতকাল পিতা মাতার ঘরে, ভাই বোনের সাথে যে জীবন কাটিয়েছে তার এক ভিন্ন রূপ শ্বশুর বাড়ি। সেখানে হয়তবা আছে বঁধূকে নানাভাবে অত্যাচার ও যন্ত্রণা দেয়ার উপায়। বিবাহোত্তর জীবনের অত্যাচারের আর্তি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক রূপসী বধূর কণ্ঠে চিত্রিত হয়েছে।

চাচাজী আইছেগো রাইমনা বইছেগো এতো সুন্দর।
ভাতিজী আমার কমলা কেমনে দিতাম তুইল্যা।।
মায়ের কাছে কইয় যাইয়া বড় সুখে আছি,
পিন্দনের অইনা বস্ত্রের দুঃখে কলাপাতা পিন্দিরে,
দুললবের ভাইরে মায়ের কাছে কইয় এই সুর যাইয়া।।
বাবার কাছে কইয় যাইয়া আলেম মোল্লার দোয়া চাই,
বাবার কাছে কইয় যাইয়া এই সুর যাইয়া।।
হুফুর কাছে কইয় যাইয়া বড় সুখে আছি,
মাথার অইনা উকুন আমি-পাল্লা দিয়া মাপিরে;
দুললবের ভাইরে হুফুর কাছে কইয় এই সুর যাইয়া।।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অনেকে অন্যত্র চাকুরী করে। এঁদের কেউ কেউ গ্রামে বিয়ে করে। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই স্বামী বউকে গ্রামে রেখে কর্মস্থলে যায়। আর এদিকে নববিবাহিতা স্বামীর বিরহে ছটফট করে আর পথ পানে চেয়ে থাকে। কিন্তু স্বামীর আর আসা হয়ে উঠে না। তখন স্বামীর চাকুরীর প্রতি তার ক্ষোভ হয়। তাই নব বধূ তার বিরহের যন্ত্রণা ননদের কাছে প্রকাশ করছে:

বৈদেশ যারা চাকরী করে,
তারা কেনে বিয়া করে-গুণের ননদলো
ননদলো তোর ভাই গেল বৈদেশে।।
একলা ঘরে শুইয়া থাকি,
ভাইয়ের মতো স্বপন দেখি-গুণের ননদলো।।
হাইছের মইদ্যে লাফা বাগুন,
জ্বইল্যা উডে চিতের আগুন-গুণের ননদলো।।
টিনের ঘরে বাঁশের পালা,

স্বামীর থাইক্যা দেওর ভালা-গুণের ননদলো।।
ডালোম গাছে ডালোম ধরে
রসের ভারে ঝুইল্যা পড়ে—গুণের ননদলো।।

মূলতঃ মেয়েলী গানের অধিকাংশ-অংশ জুড়ে নারীর অন্তর-বেদনারই বর্ণনা। এই প্রসঙ্গে ডক্টর মাযহারুল ইসলাম বলেন, বাংলা লোকসঙ্গীতের বহু অংশে নারীর প্রাণের যন্ত্রণা, তার অমর্যাদা, পুরুষ কর্তৃক তার লাঞ্ছনার যে করুণ ও প্রাণস্পর্শী বর্ণনা আছে তা লোকসাহিত্যের সুদৃঢ় সমাজভিত্তিক ঐতিহ্যের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।.....[১]

।।২।।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীতে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়। কখন থেকে এই নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয় তা বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম খান লিখেছেন 'এই নৌকা বাইচ একটি পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। কখন থেকে এই নৌকা বাইচের সূত্রপাত তার সঠিক ইতিহাস জানা যায় নাই, তবে সুদূর অতীকাল থেকে মনসা পূজা উপলক্ষ করে ভাদ্র মাসের প্রথম তারিখে তিতাস নদীতে এই নৌকা বাইচ হয়ে আসছে। এ অনুষ্ঠানটির প্রাচীনতা সম্পর্কে ত্রিপুরা জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, ১৯০৮ সনে অনুষ্ঠিত নৌকা বাইচ ছিল একটি ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতা।"...[২] নৌকায় একজন কর্তা ব্যক্তি থাকতো যিনি গান ধরতো আর অন্যান্যরা সমস্বরে ধূয়া তুলতো—

আগের নাও ধাপ্পুর ধুপ্পুর
পিছের নায়ে ছইয়া,
ছইয়ার ভিতর বইয়া রইচে
ডিব্বা সাবের মাইয়া।
ডিব্বা সাবের মাইয়াগো কাইন্দনা
আয়না দিমু কাইই দিমু,
সীতা পাইড়া ধুতি দিমু কাইন্দনা।।

অথবা,

পিরিত যতন, পিরিত রতন,
পিরিত গলার হার।
পিরিত করে যে জন মরে
সফল জীবন তার।।
হেইও—হেইও—হেইও—হেইও---ও - -ও— ।।

বর্ষা মওসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছোট বড়—নদীতে নৌকা বাইচ হয়। বাইচে যে নৌকা জয় লাভ করে সেই নৌকার মালিকের নাম ধরে তারা গানের ধূয়া তুলে—

ও...রে...মিয়া ভাই-
নাও দৌড়াইয়া কলসী লইয়া যাই।
কালু মিয়ার নায়ের মইদ্যে ঘন ঘন ঘোরা
আষ্ট বৈঠায় টান দিলে শূন্যে মারে উড়া।।

ভিক্ষা কোন পেশা নয়। তবু দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্ধ ভিক্ষুকরাও বাসে বা রেলে যাত্রীদের কাছ থেকে যে সুর করে পয়সা রোজগার করে থাকে। এ রকম একটা গানের নমুনা—

আমি অন্ধ জন্মের কানা সবার কাছে হাত বাড়াই।
আল্লাহ্ পাকে খাইবার দিলো দশ ভাই-বোনের কামাই।।
টাকা বলেন পয়সা বলেন সঙ্গের সাথী না-
ভাই বলেন আর বন্ধু বলেন কেউতো কারো না।
একেলা চলিয়া যাবেন সঙ্গে কেহ যাবে না।।
জানের ছদকা মালের জকাত দয়া লাগে যার।
সাত দোজখের আগুন আল্লায় কইরা দিবে মাফ।।
কোলেতে বাচাইয়া রাখেন কোলের সোনা চান।
ডাইন হাতেতে আমলনামা কইয়া দিয়েন দান।।

তাছাড়া, এই অঞ্চলের ভিক্ষুকদের মুখে মুখে শোনা আর একটি গানে আছে—

কে পারে বুঝিতে মহিমা তোমার—।
তোমার লীলা তুমি বুঝ বুঝে কোন জনে।।
অসীম ক্ষমতা আল্লা দয়ার সীমা নাই।
পাহাড়কে দরিয়া বানাও কুদরত তোমার।।
দান কর জকাত কর কর দ্বীনের কাম।
মরিয়া কবরে গেলে পাইবারে আছান।।
মউত নিদান আল্লা মউত নিদান।
ছেলে মেয়ে সামনে থুইয়া কাইড়া নিবে জান।।
কি করিবে ছেলে মেয়ে কি করিবে ভাই।
মউতের কালে বান্দা সামনে কেহ নাই।।
ফিরিয়া না চাইবে আজরাইল কেবা ছোড় বড়।
ঈমান আইন্যা আল্লার বান্দা সবাই নমাজ পড়।।
কাইল হাশরে নমাজ হইবে অনেক ভারী।
তাই বলিবেন কোথায় রইলেন আমার দ্বীনের নবী।।
একদিন আমার দিনের নবী করে যায় গো দান।
দানের দরজা বড় হাদীসে প্রমাণ।।
জানের ছদ্‌কা মালের জকাত যে মমিনে করে।
অতি মহব্বতে আল্লাহ্ বেহেশতে নিও তারে।।

যাদু টোনা বিষয়ক একটি প্রচলিত গল্পে আছে: এক স্ত্রী স্বামীর কাছে বায়না ধরলো কুমীর হওয়ার জন্য। স্বামী এক পেয়ালা পড়া পানি দিয়ে বললো যখন সে কুম্ভীর হবে তখন এই পানি ছিটিয়ে দিলে আবার মানুষ হবে। সে যখন কুমীর হলো সকলে ভয়ে পালিয়ে গেল। অবশেষে সে পানিতে ঝাপিয়ে পড়লো। আজও এই অঞ্চলের লোকেরা করুণ বিলাপ করে লোকটির জন্য।

কুম্ভুর কুম্ভুর (কুমীর) শব্দরে শুনি গাছের গায়ে বসিয়া,
লব্বর কইরা (হঠাৎ করে) নিলরে কুম্ভুর বুকে শেল দিয়া।।
পাড়া কান্দে, পড়শী কান্দে, কান্দে রইয়া রইয়া (থেমে থেমে),
কুম্ভুরিয়ার মায়ে কান্দে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া।।
কুম্ভুর কুম্ভুর শব্দরে শুনি গাছের আগায় বইয়া,
লব্বর কইরা নিলরে কুম্ভুর বুকে শেল দিয়া।।
পাড়া কান্দে, পড়শী কান্দে, কান্দে রইয়া রইয়া,
কুম্ভুরিয়ার বোনে কান্দে গড়াইয়া গড়াইয়া।।
কুম্ভুর কুম্ভুর শব্দরে শুনি গাছের আড়াল থাইক্যা,
লব্বর কইরা নিলরে কুম্ভুর বুকে শেল দিয়া।।
পাড়া কান্দে, পড়শী কান্দে, কান্দে রইয়া রইয়া,
কুম্ভুরিয়ার বউয়ে কান্দে চোখে মরিচ দিয়া।।..[৩]

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় 'মলয়া' সঙ্গীত প্রচলিত রয়েছে। লোক ঐতিহ্যের ধারার কবি মনোমোহন দত্ত এই গানের রচয়িতা। তাঁর গানের মূল বিষয় হলো—মানব প্রীতি ও ভগবৎ সাধনা। দেহের মধ্যে যে পরমাত্মা রয়েছে তাকে ধরা কঠিন। মনোমোহন দত্ত তাকে ধরবার কৌশলই নিম্নোক্ত গানে দেখিয়েছেন:

রাগিনী পিলু-তাল যৎ
ধর্ ধর্ ধর্ তোর পোষা পাখী, যেতে দিসনা তারে উড়ি।
ভক্তি ফাঁদে ফাঁদ পাতিয়ে, আখিতে লাগায়ে ডুরী।
চায় যদি সে ফাঁকি দিতে, ভুলিসনা তুই তার ফাঁকিতে,
সে যা বলে করিস না তাই, তবেই ভাই রবে পড়ি।
ছটফটাবে যতই সে, থাকিস না তুই তাহার পাশে,
আড়াল থেকে দেখবি কেবল, পাগল নাচে কেমন করি
সায় দিবি না তার কৌশলে, চলবি কেবল উল্টা কলে,
মনোমোহন কয় তাহা হইলে, অবহেলে যাবি সারি।....[৪]

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল, কালিকচ্ছ অঞ্চলে প্রচলিত দুর্ভিক্ষের একটি সারিগানে তৎকালীন দেশের চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

দারুণ কাত আবার আইল দেশে
আচনিক বেশে,
কাইন্দা হগল লুক পরানের ত্রাসে।—ঐ
হায় অন্ন হায় অন্ন বুলি উঠিল আহাকার

অকুইবারে শূন্য ঐল লক্ষ্মীর ভান্ডার।—ঐ
পোলা কান্দে, মাইয়া কান্দে খাইতে দেও বৈলে
হেই দুক্কে মরিল কত মানুষ, দড়ি দিয়া গলে।—ঐ
বরিশালের ইমাম কৈলাম স্বাক্ষী আছে তার
ঢাকাতে শুকাইয়া প্রাণীর গেল ছয় জনার।—ঐ
ত্রিপুরার মরণ খবর গুপ্তভাবে আছে
রাষ্ট্র হইয়া ছিল মাত্র কর্তাপক্ষ কাছে।—ঐ
যুগ্য নয় দান খয়রাতের হৈয়া গেল মানা
অকালে নাই দেশে বুলি করছে তানা নানা।—ঐ
রংপুরাতে রং ধইরাছে ফরিদপুরে বারা
চাট্টীগাও আর সুধারামে হৈয়া গেল সাড়া।—ঐ
লক্ষ্মী-বর পুত্রগণ যেমন সিঙ্গে আছে
গরীব দুক্কী তাই তথাতে প্রাণে বাইচ্চা আছে।—ঐ
কোন বিদি এমনি বিদি লেখেছিল কপালে
ধৈন্য ধৈন্য কলির রাজ্য এই ভব মণ্ডলে।—ঐ
চাইল নাইরে, ডাইল নাইরে কড়ি নাইরে আতে
উপাস থাইক্যা মরচে লুক মাগি, পোলা, সাতে।—ঐ
কেচু ঘেচু লতা পাতা যা আছিল সম্বল
দারুণ্যা বর্ষার জলে সব করি তল।—ঐ
নাইল্লা ধান দেইক্কা কিছু আশা হৈয়াছিল
আচাম্বত ঢলের জলে ভাসাইয়া নিল—ঐ
নীচে জল উপরে জল ধরা টলমল
আখেরী কোমত আইয়া ভাসাইল হগল।—ঐ
গউর বলে নেইগ আর জীয়নের আশা।।
এইকাতে জাইন্ন মাত্র ঈশ্বরই ভরসা।।—ঐ...[৫]

ময়মনসিংহ জেলা বাংলাদেশের জারী গানের প্রধান কেন্দ্রভূমি হলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার মহরমের জারীর প্রসিদ্ধি রয়েছে। এই অঞ্চলে রুমাল উড়িয়ে উড়িয়ে, নৃত্যের তালে তালে, বাদ্যযন্ত্র যোগে জারীগান গাওয়া হয়। একজন মূল গায়ক ও ধূয়া ধরার জন্য তার দল থাকে। করুণ রসের আধিক্যে ভরপুর এই গান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোক সঙ্গীতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রয়েছে। বর্তমান কালের শহুরে সভ্যতার রকমারী চমক এই অঞ্চলের লোক জীবনেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছে। ফলে, কালক্রমে এইসব লোক সংগীত হয়ত অপ্রচলিত হয়ে পড়বে বা বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যাবে। তাই অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এ অঞ্চলের গানগুলোও সংগৃহীত হওয়া দরকার।

তথ্যনির্দেশ

১ মযহারুল ইসলাম, লোক সাহিত্যে জনজীবন ও প্রাণের স্পন্দন: একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক সমীক্ষা, *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য,* শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ভাদ্র ১৩৯২, পৃ. ৪২
২ সিরাজুল ইসলাম খান গণউৎসব ও নৌকা বাইচ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৯৮৪, পৃ.৩৮
৩ তিতাশ চৌধুরী, *কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য,* বাংলা একাডেমী, মে ১৯৮৩, পৃ. ১৫৩
৪ মনোমোহন দত্ত, *মলয়া,* ১ম খণ্ড, গান ৬৯, পৃ. ৪০
৫ *ত্রিপুরা হিতৈষী,* ভাদ্র, ১৩৩৩